



গাইবান্ধায় ১ টাকা বেতনে শিশুদের বর্ণমালা শেখান শিক্ষক লুৎফর রহমান।

ছবি : কালের কণ্ঠ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক >

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ বুধবার। দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন পৃথকভাবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করে থাকে। দিবসটি পালনের জন্য বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৬ জাতীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠপোষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও সমন্বয়ক শিক্ষক-কর্মচারী একাজেটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

>> পৃষ্ঠা ৭ ক. ৩

স্যার...

অমিতাভ দাশ হিমুন, গাইবান্ধা >

শিক্ষক। শব্দটির ওজন, উচ্চতা, মাহাত্ম্য আর মমতার কোনো পরিমাপ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন এমন আর কেউ নেই যিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষকের কথা মনে করে চোখ ভেজাবেন না। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ চেনার আগেই শিক্ষকের মুখ একটি শিশুর মগজে প্রবেশ করে। ফলে শিক্ষকের মুখ অনিবার্য এক বর্ণমালা। একটা সময় ছিল যখন কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের স্যারের বাসায় ঘুমাত। এরপর ভোররাত্তি উঠে স্যারের বৈঠকখানায় পাটি পেতে বসে চলত পাটিগণিত শেখা। এরপর স্যারের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে স্যারের সঙ্গে ফুলে যাওয়া। আমাদের আছে এমন লাখে দুষ্টান্ত। গল্প নয় সত্যি। দৃশ্যকল্প নয়, বাস্তব। সেই দিনের কথা। পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। শহরে সেই পরীক্ষার কেন্দ্র। গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে শিক্ষকের। তাঁর ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। তার ভালো ফল হবে। শিক্ষকের বুক চওড়া হবে। এ নিয়ে সাত দিন আগে থেকে চলে প্রস্তুতি। পরীক্ষার দিন সকালে একটা বাইসাইকেল নিয়ে বের হন শিক্ষক। সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে তাঁর আদরের ছাত্রটিকে

>> পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ

>> শেষ পৃষ্ঠার পর

দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হবে। এরপর দুপুর ১২টায় ঢাবির টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও শিক্ষক সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, রাশেদা কে চৌধুরী, ইউনেসকো প্রতিনিধি বিয়াদ্রিস কালডুন প্রমুখ।

জানা যায়, ১৯৯৪ সালে ইউনেসকোর ২৬তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ৫ অক্টোবরকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রায় ১০০টি দেশে এই দিবসটি পালন করা হয়।

11

স্যার ...

>> শেষ পৃষ্ঠার পর

বসান। এরপর চলতে থাকেন পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে। পরীক্ষার হলে ঢোকে ছাত্র, আর কেন্দ্রের প্রধান ফটকে বসে থাকেন শিক্ষক। পরীক্ষা শেষ হলে ছাত্র এসে দেখে তার স্যার ভাব হাতে আপেক্ষা করছে। ছাত্রের হাতে ভাব তুলে দেন শিক্ষক। শিক্ষকের হাতে প্রশ্নপত্র তুলে দিয়ে ছাত্র ভাবের পানি খায়। শিক্ষক দেখেন প্রশ্নপত্র। এরপর ছাত্রের দিকে তাকিয়ে শিক্ষকের অনর্গল প্রশ্ন— 'এটা হয়েছে? এটা কমন পড়েনি? ওই প্রশ্নের উত্তরে কী লিখেছিস? কেন? এটা হবে কেন? তোকে না নদী পার হতে হতে বললাম, যেটা খুব ভালো পারবি সেটা আগে লিখবি। বাহ! এটা ঠিক উত্তর দিয়েছিস। হবে তো? পাবি তো সর্বোচ্চ নম্বর। পারতেই হবে বাপ।' এরপর মিস্ট্রি দোকানে বসে পাউরুটি আর রসগোল্লা খায় ছাত্র-শিক্ষক। আর হাতে-মুখে পানি দিয়ে তাড়াহুড়া করে। এক ঘণ্টার বিরতির পর আবার পরীক্ষা।

স্যার আপনাকে সালাম। ভাবছেন এখন কি আর সেই দিন আছে? নিশ্চয় আছে স্যার। আপনার ছাত্ররা কি আর সেই দিন ভুলতে পারে। 'ওই বৃকের মমতা কি কুরিয়ে যাওয়ার?' স্যার, এখন ২০১৬ সাল। জায়গাটা গাইবান্ধা শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে মদনেরপাড়া। সেখান থেকে পাকা রাস্তা ধরে আরো তিন কিলোমিটার পাড়ি দিলে পাওয়া যাবে বাগড়িয়া গ্রাম। এখানে বাস করেন একজন শিক্ষক। স্যারের নাম লুৎফর রহমান। বাগড়িয়া গ্রামের প্রথাগত কোনো বিশেষত্ব হয়তো নেই। কিন্তু লুৎফর রহমান স্যারের জন্য এই গ্রাম গর্বের-মাহাত্ম্যের। তিনি কোনো ফুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক নন। তাকে বলা হয়, 'এক টাকার মাস্টার'। মানে এই এক টাকা কোটি কোটি বর্ণমালার দীক্ষা। আলোকিত একটা মোমের মতো, যা শেষ হয় না, কেবল জ্বলে থাকে। বয়সের মাপে তিনি এখন বৃদ্ধ। নদীভাঙনে সর্বস্ব হারিয়েছেন। আত্মীয়স্বজন অনেকে অর্থবিত্তের মালিক। কিন্তু সব হারানো এই নির্মোহ মানুষটি গ্রামের এক কোণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে একটি ছোট্ট টিনের ঘরে বাস করেন। আর বাগড়িয়া গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালানোর মাইলফলক হয়ে আছেন। গ্রামের সবাই জানে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত। তাঁর প্রতিদিনের কাজ। প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়ে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। কোনো রোজগারের কৌশল নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে শিশুদের বর্ণমালা শেখান তিনি। মাইলের পর মাইল ক্রমাগত হাঁটতে থাকেন। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম যান। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জোগাড় করেন। অভিভাবকদের বুঝিয়ে বই আর খাতা-কলমসহ তাদের নিয়ে কখনো রাস্তার ধারে, বাঁধে, কারো বাড়ির উঠানে, কখনো পাছতলায় বসে যান তিনি। এরপর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখান। নিজে বেশিদূর

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শিখতে পারেননি। সেই আফসোস থেকে নদীভাঙা দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর মমতার শেষ নেই। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করাই তাঁর লক্ষ্য।

লুৎফর রহমানের ছাত্র পাশের গ্রামের জাহেদ আলী (৪৫) জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখছেন লুৎফর রহমান এভাবেই ছেলেমেয়েদের পড়ান। অনেকেই তাঁকে এক সময় পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। পরিবারে সীমাহীন অভাব। তার পরও দমে যাননি এই মানুষটি। বাগড়িয়া, মদনেরপাড়া, পলবন্দি, চন্দিয়া, ঢুলিপাড়া, কাকুপাড়া ও পূর্বপাড়া এ পর্যন্ত শত শত ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছেন। তাঁর অনেক ছাত্র এখন শিক্ষক, পুলিশ, ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত।

তাঁর ঘনিষ্ঠজন হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, ওই মানুষটির সাহচর্য পেতে তিনি সময় পেলেই সেখানে চলে যান। তাঁর কাজ দেখে নিজে শেখার চেষ্টা করেন। লুৎফর রহমান ঘরে ঘরে গিয়ে শিশু ও অভিভাবকদের বোঝান, ছেলেমেয়েদের ফুলে যাওয়ার কথা বলেন।

গাইবান্ধার শিক্ষাবিদ রংপুর কারমাইকেল কলেজের সাবেক অধ্যাপক মাজহার উল মামান বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কীর্তি আমার জন্য। এই মানুষটি বিদ্যার ফেরিওয়ালা। নীরবে-নিভৃতে অবহেলিত-দরিদ্র পরিবারের মানুষের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক গোলাম সাদেক লেবু বলেন, একটি বাইসাইকেল কেনার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি ছেলেমেয়েদের পড়ান প্রায় ৪০ বছর ধরে। ছোট্ট সোনামণিদের আলোর পথ দেখাচ্ছেন এই মানুষটি।

গাইবান্ধা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আশরাফুল মমিন খান বলেন, লুৎফর রহমান একজন সাদা মনের আলোকিত মানুষ। উপজেলা প্রশাসন তাঁর কর্মকাণ্ডকে বিকশিত করতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। লুৎফর রহমান বলেন, 'আমি খুব সামান্য মানুষ। যতটুকু জানি তাই শেখাই। লেখাপড়া না শিখলে জীবনে কী কষ্ট নেমে আসে তা আমি বুঝি।' পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী বাবু বলল, 'স্যার আজ বহুদূর থেকে হেঁটে এসেছেন। তার পরও আমাদের এক ঘণ্টা ধরে পড়ান। কিন্তু মুখের হাসি কখনো মিলিয়ে যায়নি।'

১৯৫০ সালের ৭ আগস্ট গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়ায় জন্ম লুৎফর রহমানের। বাবা ফাইয়ুদ্দিন ব্যাপারী মারা গেছেন অনেক আগে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট তিনি। ১৯৭২ সালে ফুলছড়ি উপজেলার গুণভরি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৭৪ সালে নদীভাঙনে সব হারিয়ে সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের বাগড়িয়া গ্রামের ওয়াপদা বাঁধে আশ্রয় নিয়ে কোনোমতে মাথাগুঁজে আছেন।